তালা ও তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের মিষ্টি পানির বিলে

প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে দেশী মাছ সংরক্ষণ

উত্তরণ

তালা ও তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের মিষ্টি পানির বিলে

প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে দেশী মাছ সংরক্ষণ

রচনায়

শহিদুল ইসলাম

মনিরুল মামুন

তথ্য সহযোগিতায়

ওবায়দুল হক পলাশ

বদিউজ্জামান

সুধাংশু কুমার সরকার

উত্তরণ

রচনায় :
শহিদুল ইসলাম
মনিরুল মামুন

তথ্য সহযোগিতায় :
ওবায়দুল হক পলাশ
বদিউজ্জামান
সুধাংশু কুমার সরকার

প্রকাশনা :
রিসার্স এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল
উত্তরণ
মার্চ ২০০৯

যোগাযোগ :
উত্তরণ
৪২, সাত মসজিদ রোড (চতুর্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা -১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮-০২-৯১২২৩০২
ই-মেইল : uttaran@bdonline.com
Website : http://www.uttaran.org

প্রচ্ছদ : শেখর কুমার বিশ্বাস
অংকুর, খুলনা

ডিজাইন :
এস. আকাশ-অংকুর, ৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৪১-৮১৩৮৬০

মুদ্রণে : প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৪১-৮১০৫৯৭

পরিচালকের কথা

আমার শিশুকালে যখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তখুনি একটি প্রিয় ও আগ্রহের বিষয় ছিল খালে-বিলে পানি শুকিয়ে যাওয়ার কালে পানি সেঁচে মাছ ধরা দেখা। শিশু বয়সে আরও অনেকের সঙ্গে বিস্ময়ের সঙ্গে সেই মাছ ধরা যেমন দেখেছি, তেমনি কৈশোরে নিজেই পানি সেঁচে, মাছ ধরে এক অপার আনন্দে মেতে উঠেছি। সে কি আনন্দ! এক একটি খাল-নালা বা কুঁয়োয় মাছ ধরা আর যেন গোটা পাড়া জুড়েই উৎসব! শুধু কি মাছ ধরা! পানি-কাদায় গোটা শরীর একাকার হয়ে গিয়ে খালুই ভর্তি করে মাছ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। কত রকমের বিচিত্র সে মাছ। খেতেও খুবই সুস্বাদু। মাছ খাওয়াতো বটেই, বিলিয়েও যেন অপার সুখ! কোন্ খালের বা কার জমির, কোন্ বিলের, কোন্ কুঁয়োর মাছ প্রভৃতি স্বত্ত্ব বা মালিকানার বিষয়গুলো একেবারেই মূখ্য ছিলনা। যে কারও খালে-কুঁয়োয় যে কেউ মাছ ধরতে পারতো। সকলেই তা মিলেমিশে ভোগও করতে পারতো।

এই অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র আমার নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় গ্রামগুলোয় ১৯৮০-র দশকেও এই চিত্র কারও নজর এড়ায়নি। স্মৃতির পাতা হাতড়ে আজ একথাগুলো বলার একটি মাত্রই কারণ তা হচ্ছে, গ্রাম-বাংলার এই দৃশ্য আজ আর নেই। তালা উপজেলার তালা ও আশেপাশের গ্রাম-ইউনিয়নগুলোর এই পরিচিত দৃশ্যগুলো একেবারেই চোখে পড়ে না। ২০০০ সালের কিছু আগে বা পরে যারা জন্ম নিয়েছেন, সেইসব শিশু-কিশোরদের কাছে এটিতো রীতিমত গল্প! আমরা যেমন দাদা-দাদীর কাছে বসে দৈত্য-দানব-রাজকুমারের গল্প শুনেছি; আজকের শিশুদের তেমনি আমাদের গ্রাম-বাংলার চির পরিচিত দৃশ্যাবলীর গল্প শুনাতে হয়। গল্প থেকেই শিশুরা হয়তো জানতে পারে আমাদের বিলে-জলাভূমিতে কত ধরণের মাছ ছিল। বিলে-খালের শোল-টাকি-পাবদা-পুটি-রয়না-খলসে-কৈ-মাগুর প্রভৃতি মাছগুলো কোথায় এবং কেন হারিয়ে গেল? নানান কারণে এগুলো হারিয়ে গেছে। এরমধ্যে প্রাকৃতিক কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট কারণও রয়েছে। আমরা একটু উদ্যোগ নিলে আমাদের বিলে-জলাভূমিতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই দেশী প্রজাতির মাছগুলো সংরক্ষণ করতে পারি। হয়তো গ্রাম-বাংলার সেই পরিচিত মাছ ধরার দৃশ্য আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়; তবে দেশী প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করে স্থানীয় অধিবাসীর পুষ্টি চাহিদা মেটোনো সম্ভব। আর প্রতিরোধ করা যেতে পারে বিদেশী মাছের দাপুটে বিকাশ। সত্যি কথা বলতে কি, বিদেশী মাছের অবাধ বিকাশে আমাদের প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

দেশী প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে উত্তরণ-এর অভিজ্ঞতা একেবারে কম নয়। উত্তরণ চায় দেশী প্রজাতির মাছ সগর্বে, বলিষ্ঠভাবে টিকে থাকুক। আমাদের খাল-বিলে দেশী প্রজাতির মাছের সংরক্ষণাগার হিসেবে গড়ে উঠুক। একারণেই দেশী প্রজাতির মাছ

হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলো খুঁজে দেখার পাশাপাশি সংরক্ষণের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার লক্ষ্যেই এই পুস্তিকার অবতারণা। উত্তরণ চায় এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও অনেক মানুষ দেশী প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এগিয়ে আসুক। বলাইবাহুল্য, সকলের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া একটি বা দুটো উদ্যোগে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করা সম্ভব নয়। দেশী মাছ সংরক্ষণে এই চেষ্টা যদি বিন্দুমাত্র কাজে লাগে, তবে আমাদের চেষ্টা-শ্রম সার্থক বলে মনে করবো। আসুন, সকলে মিলে দেশী মাছ রক্ষা করি।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
মার্চ ২০০৯

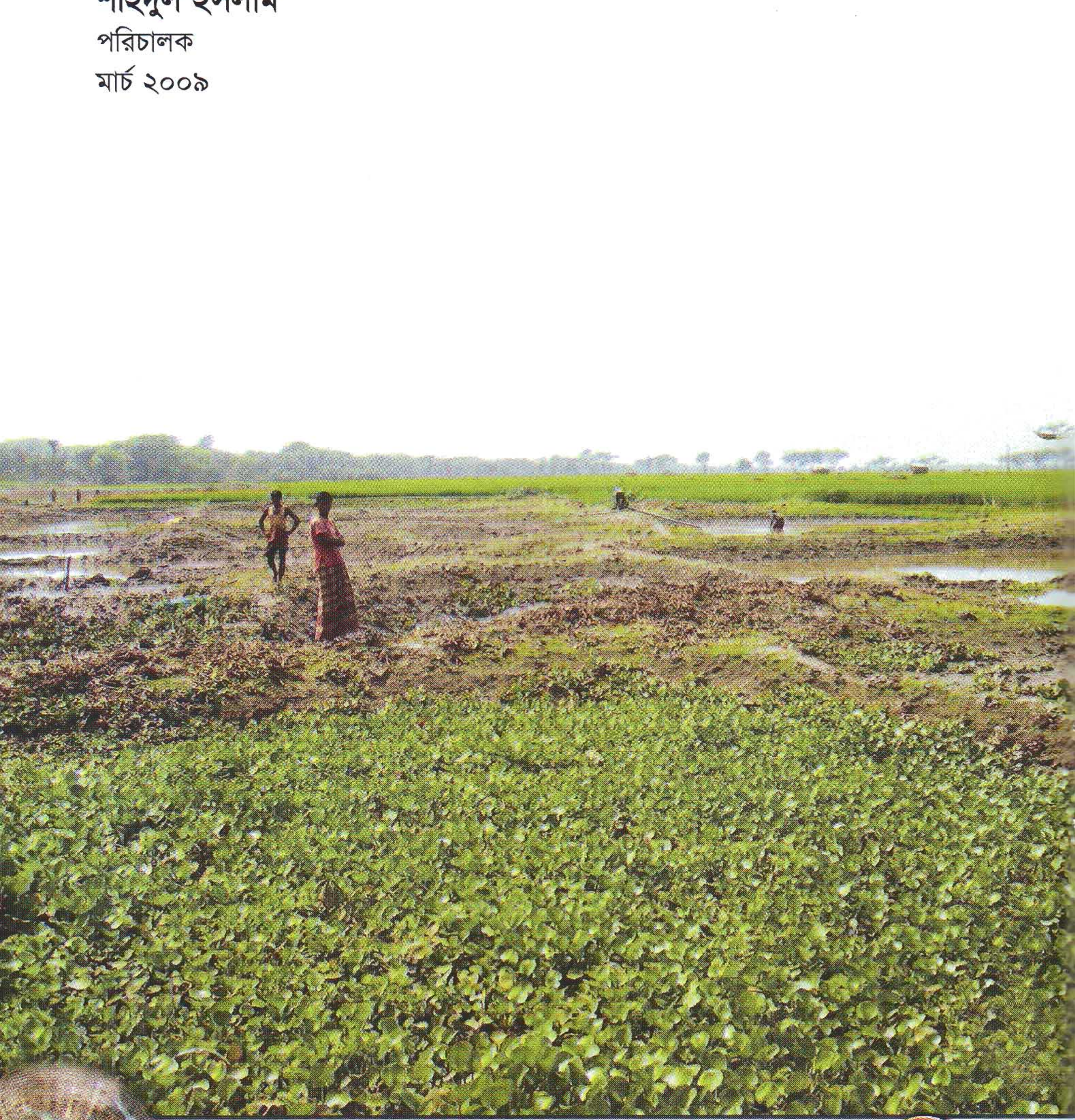

একসময় বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি পানির মাছ উৎপাদনকারী দেশ। বিশ শতকের ষাট এবং সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০% আহরিত হতো দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে। মিষ্টি পানির মাছের অধিকাংশই উৎপাদিত হতো প্রাকৃতিকভাবে এবং তা ছিল সবই দেশীয় প্রজাতির । পদ্মা, মেঘনা, যমুনার প্লাবনভূমির বিল, খাল, হাওড়, বাওড় এবং নীচু এলাকা যেখানে বর্ষায় পানি আটকে থাকে, সে সকল জলাভূমি হলো দেশীয় মাছের আবাস অর্থাৎ তার প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র। এই জলাভূমির পরিমান ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। কিন্তু সংরক্ষণের অভাব, জলবায়ুর পরিবর্তন, মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ড এবং জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মিষ্টি পানির দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে গেছে।

IUCN কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ৫৪ প্রজাতির মাছ এখন বিলুপ্তির পথে। এর মধ্যে ১২ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব মহাবিপন্নের তালিকায়, আর ১৪ প্রজাতির মাছ সংকটাপন্ন। গবেষক ফিলিপ গাইন সম্পাদিত 'ফিশারিজ ঃ বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ফেসিং দ্যা লাষ্ট সেঞ্চুরি' শীর্ষক গ্রন্থে দেশীয় মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে বাংলাদেশে যত প্রজাতির মিঠা পানির মাছ আছে, তার অর্ধেক পরিমান কমে গেছে। বর্তমানে প্রতি বছর ৯ % হারে মিঠা পানির মাছ কমে যাচ্ছে। যদি এই হারে কমতে থাকে, তাহলে আগামী ৫০ থেকে ১০০ বছর পর মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছ বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে ১২০ প্রজাতির মাছ। (দৈনিক সমকাল ০৯/০৩/২০০৯)

দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলার তালা, কলারোয়া এবং যশোর জেলার কেশবপুর ও মনিরামপুরের একাংশ এক সময় মিষ্টি পানি নির্ভরশীল দেশীয় প্রজাতির মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। মূলত: এ অঞ্চলটি গাঙ্গেয় প্লাবণভূমির অংশ এবং এখানে আছে অসংখ্য বিল ও বাওড় যা মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এলাকা। তালা উপজেলার মিষ্টি পানি নির্ভরশীল বিলগুলির মধ্যে অন্যতম বিল হলো: পালশের বিল; দাতের বিল; বাগের বিল; হিংলার বিল; বানকুড়োর বিল; পদ্মখোলার বিল; শুভাষিনি উত্তর পাড়ার বিল; শুভাষিনির বিল; হাতবাসের বিল; দইসারার বিল; বাগের বিল (ঋষিপাড়া) এবং মথুরার বিল।

এই বিলগুলোর প্রকৃতি ও পরিবেশ অপূর্ব। বিলের উঁচু অংশে ৬ থেকে ৮ মাস পানি থাকে এবং নিম্ন অংশে সাধারণত: ১২ মাসই কম-বেশী পানি থাকে। নিম্ন অংশে ব্যক্তি-মালিকানাধীন অনেক ছোট-ছোট গর্ত আছে যাকে স্থানীয় লোকজন কুঁয়ো বলে থাকে।

এই সকল কুঁয়ো জলজ প্রাণীর বিশেষভাবে দেশীয় প্রজাতির মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। কুঁয়োর চারপাশে হোগলাজাতীয় মিষ্টি পানি নির্ভরশীল এক ধরনের ঘাস জন্মে থাকে। তাছাড়া নানান ধরনের শৈবাল, শাপলা, কলমীলতা, শোলাসহ বিভিন্ন জলজ গাছপালা দেখা যায়। বিলের অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশ যেখানে ৬ থেকে ৮ মাস পানি থাকে সেখানে কৃষকরা সাধারণত: আমন ধান চাষ এবং সাম্প্রতিক সময় বোরো ধানও চাষ করে থাকে। বিলের এই অংশে ৬ থেকে ৮ মাস পানি থাকে। যেখানে গভীরতা কম থাকার কারণে সূর্যরশ্মি সরাসরি মাটি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে, যার কারণে প্রচুর পরিমাণ ফাইটো-প্লাংটন ও জু-প্লাংটন জন্মায়। যা মাছের খাদ্যকণা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিলের তলদেশে কুঁয়োর মাঝে আশ্রয় নিয়ে থাকা দেশীয় প্রজাতির মাছ সাধারণত: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টিপাতের সাথে-সাথে ডিম ছাড়তে শুরু করে এবং বর্ষা বাড়ার সাথে-সাথে যখন সমগ্র বিল প্লাবিত হয়ে পড়ে তখন তারা প্লাবিত অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যা মাছের ওজন বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করে।

বিলগুলো এই সকল দেশীয় পানির মাছের আবাসস্থল অর্থাৎ বিলগুলো মাছের লালন, প্রজনন এবং বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও সরকারিভাবে এই সকল বিলে মাঝে-মাঝে কার্প প্রজাতির মাছ তথা রুই, মৃগেল, কাতলা জাতীয় মাছ ছাড়া হয়। কিন্তু বিলগুলো কার্প জাতীয় প্রজাতির মাছের আবাসস্থল নয়। কারণ কার্প জাতীয় মাছ তাদের প্রজনন প্রক্রিয়া এই সকল বিলে সম্পন্ন করতে পারে না এবং তারা বংশ বিস্তার করতে পারে না।

এক সময় (প্রায় ৩০-৪০ বছর পূর্বে) এখানে দেশীয় মাছের প্রাচুর্যতা ছিল ব্যাপক। শীত মৌসুমে মাছ ধরার এক ধরনের উৎসবও হতো। কোনও পাড়ায় যখন কুয়া সেচ দেয়া হতো তখন শুধু সেই কুয়ো মালিকের বাড়িতে নয় আশে পাশের গরীব মানুষদেরকেও সেই মাছ বিলিয়ে দেয়া হতো, পাড়ায় পাড়ায় উৎসব হতো। মানুষের মুখে মুখে কোন বিলে কত প্রকারের এবং কত বড় মাছ পাওয়া যাচ্ছে তা গল্প আকারে ঘুরতো। বিলের মধ্যভাগের নিম্ন অংশের কোন একটি কুঁয়ো সেচে মাছ ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসা হতো গরুর গাড়ী করে, যা এখন রীতিমত রূপকথার গল্পের মত শুনায়।

এই সমস্ত বিলে যে সকল মাছ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

কৈ

মলা

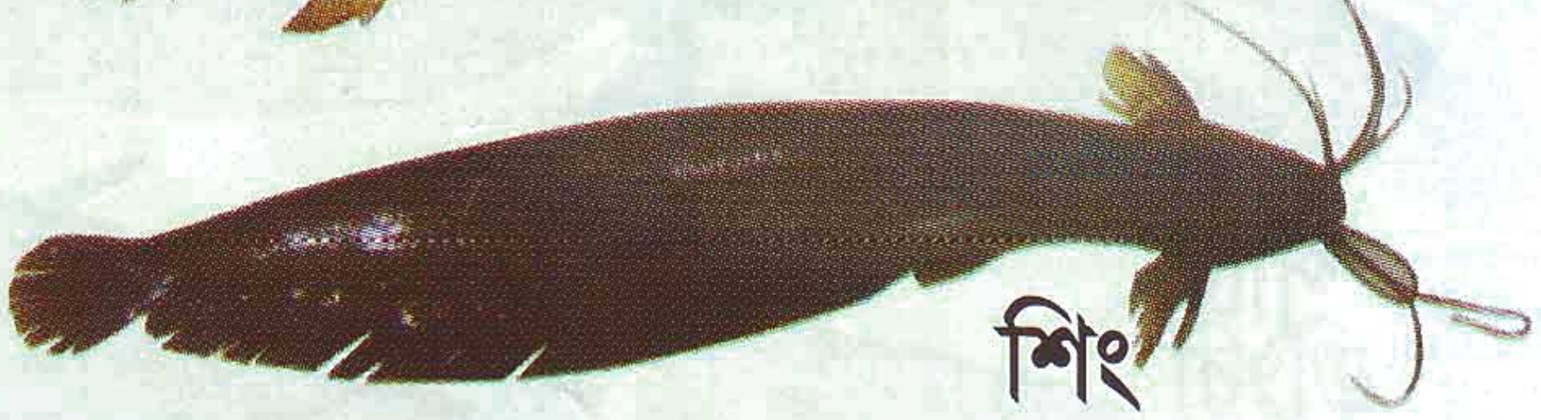

শিং

মাগুর

টেংরা

গজার

শোল

টাকি

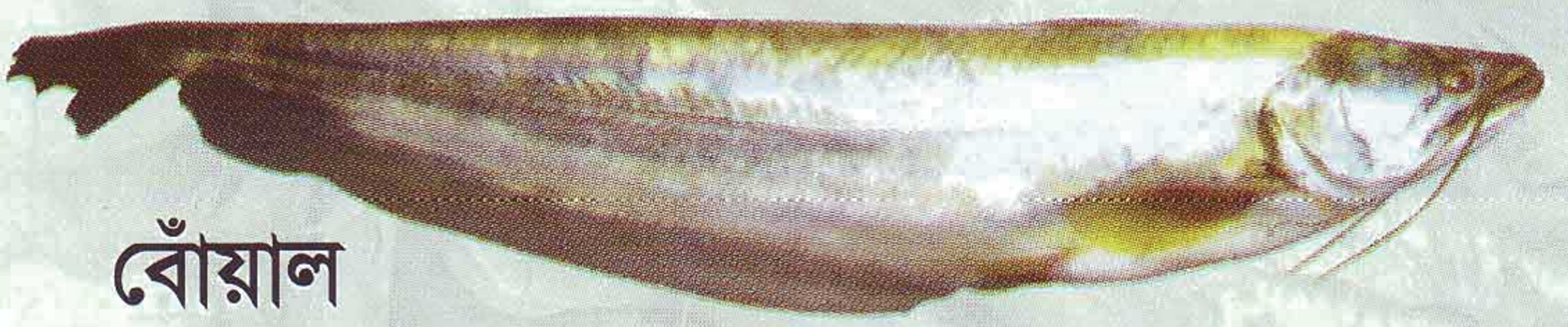

বোয়াল

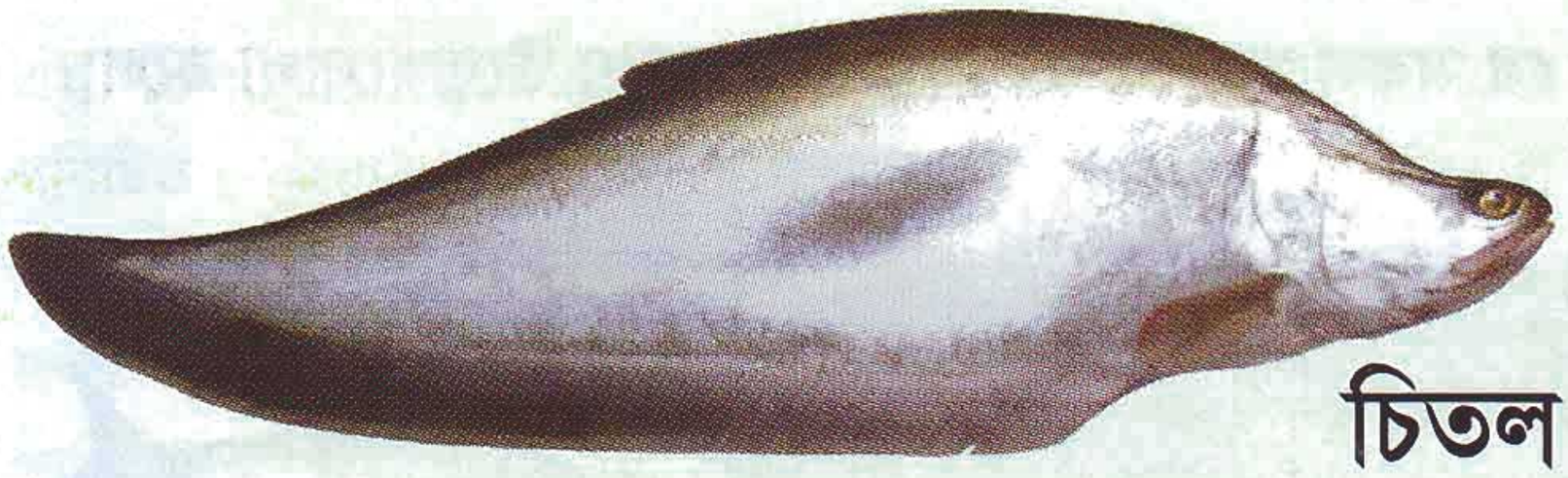

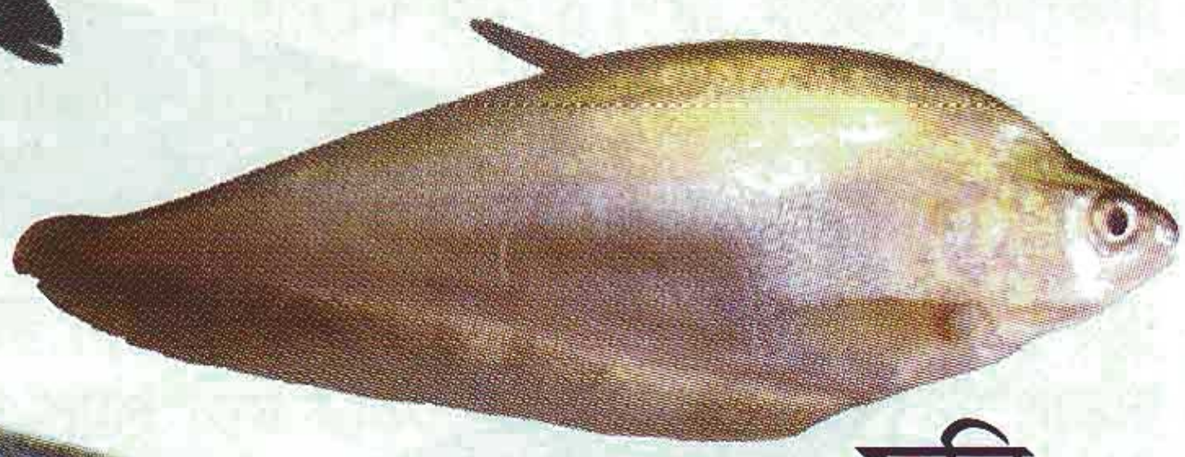

চিতল
পুঁটি
ফলি
পাবদা
কাচকি
স্বরপুঁটি
থুরে
বেঁলে

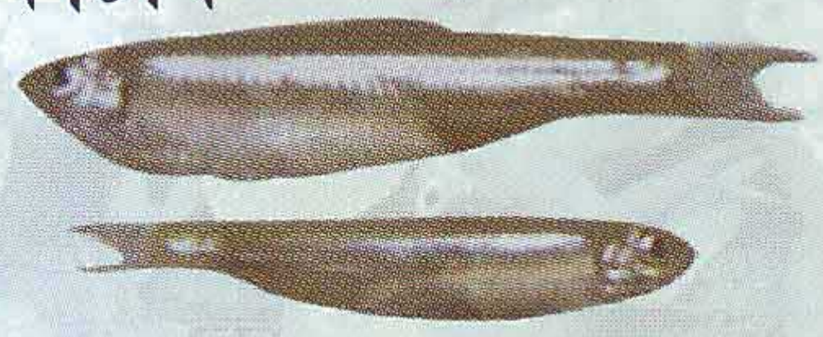

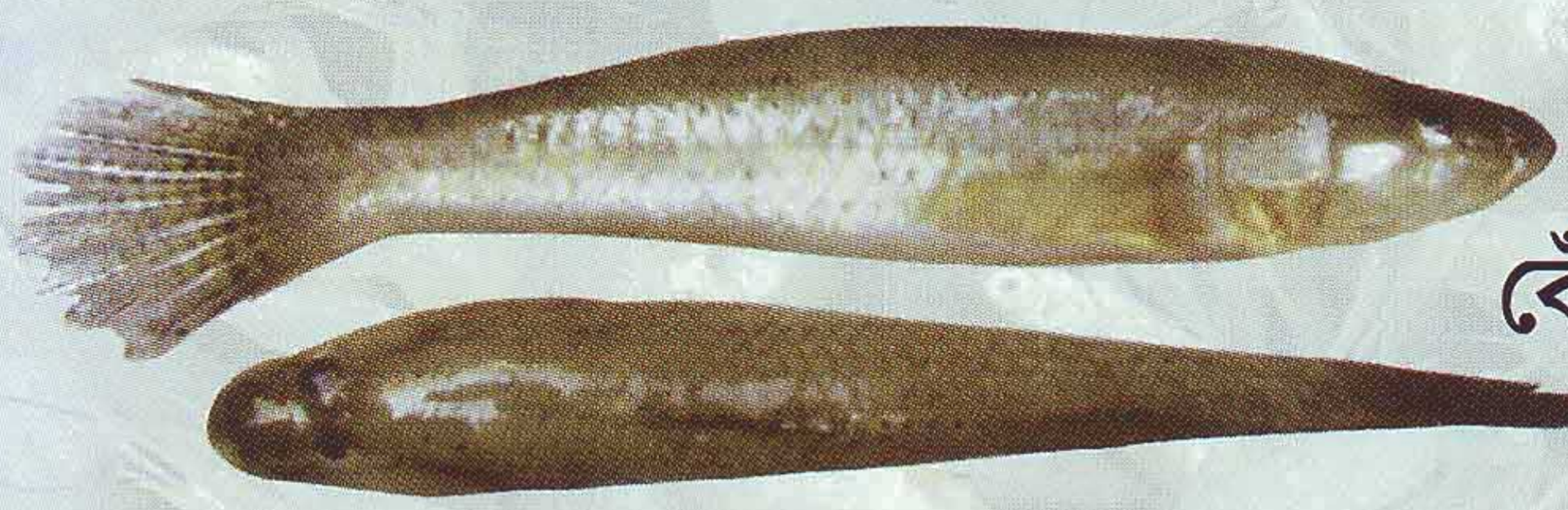

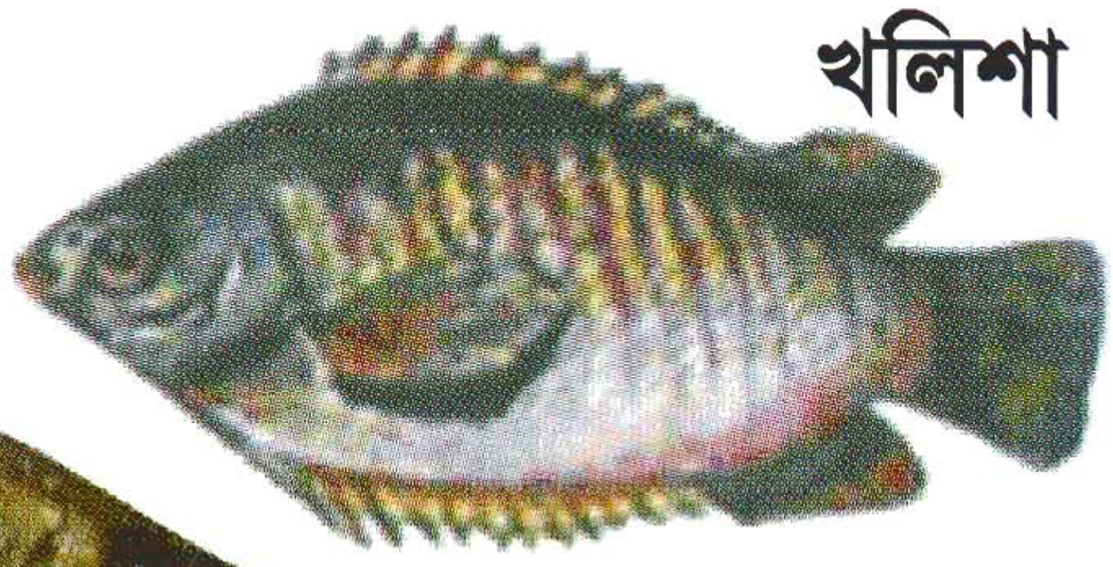

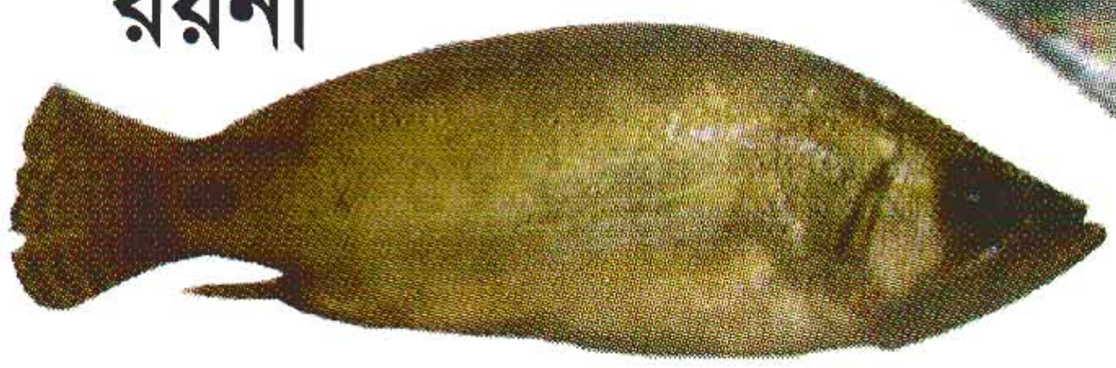

তাছাড়া এই স্থানীয় বিলের পাশে গ্রামের সাধারন মানুষরা আষাঢ় মাস থেকে পৌষ, মাঘ পর্যন্ত নিয়মিত মাছ ধরতো এবং বিলের পাশে প্রায় প্রতি গ্রামে কিছু ব্যক্তির মাছ ধরার জন্য বিশেষ নাম ডাকও ছিল। বিলের পাশে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের আমিষের চাহিদার অনেকাংশই এই বিলে উৎপাদিত প্রাকৃতিক মাছ থেকেই পূরণ হতো। এখানে উৎপাদিত উদ্বৃত মাছ বিক্রি করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জিত হতো। এমনকি বহু দরিদ্র পরিবার বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় মাছ ধরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। জেলেরা এ সকল বিলের মাছ মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বিক্রি করত।

কিন্তু আজ আর সেই দৃশ্য নেই। এই সকল বিলে আজ আর প্রাকৃতিক মাছ উৎপাদিত হয় না। এমনকি কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্তও হয়ে গেছে, যা এলাকায় আর পাওয়া যায় না। যেমন- বোয়াল, সরপুঁটি, রয়না, তারা বাইন, গ্যাঠে (গুলশা) টেংরা, নাপিত কই, এক ঠুটি বোয়াল, পাবদা, লাল চান্দা ইত্যাদি এবং আবার অনেকগুলি বিলুপ্তির পথে। তাই আর এখন গ্রামে শীতকালে মাছ ধরার উৎসব হয় না বা তা নিয়ে হয় না কোন গল্পও। দেশীয় এই এককালীন মাছের প্রাচুর্যতা এখন শুধুই স্মৃতি।

দেশী প্রজাতির মাছের বিলুপ্তির কারণসমূহ

যে সকল কারনে এই সকল বিলের প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে বা কোন কোন প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা সকল মৎস্য সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তা নীচে বর্ণিত হল:

ক) সংরক্ষণের অভাব

প্রত্যেকটা বিলের তলদেশে বা নিচু অংশে ব্যক্তিমালিকানাধীন কোথাও কোথাও খাস জলকর ও কুঁয়ো ছিল। এই কুঁয়ো ও জলকরের পাশে ছিল হোগলা জাতীয় এক ধরনের ঘাস এবং পানিতে ভেসে থাকতো কলমীলতা ও এক ধরনের সবুজ রঙের শৈবাল। এই কুঁয়ো ও খাস জলকরে সারা বছরই পানি থাকতো। কুঁয়োগুলো সাধারণত: ব্যক্তি মালিকানায় থাকায় আগে খুবই যত্ন করা হতো এবং কৃষকরা কুঁয়োগুলোতে নিয়মিত পালা (গাছের ডালপালা ফেলে রাখা) দিত যাতে মাছের আশ্রয় নিরাপদ হয়। কিন্তু দেশীয় প্রজাতির মাছের এই আবাস এখন আর নিরাপদ নেই এবং স্থানীয় মানুষজন বা কৃষকরা তাদের মালিকানাধীন কুঁয়োগুলো যথাযথভাবে খনন করে না, পালাও দেয় না এবং নিয়মিত পরিচর্যাও করে না।

খ) অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ

বিগত ৪০ বছরে এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে প্রতি একশ' জনে ৬৫ জন (৬৫%)। মাছের আবাসস্থল কমেছে উল্লেখজনকহারে। জনসংখ্যার এ বৃদ্ধিতে মাছের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে মাছ আহরণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। জনসংখ্যার অধিক চাপ ও মাছের তথা আমিষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনের তাগিদে স্থানীয় লোকজন বর্তমানে এই জলকর বা কুঁয়োগুলো একাধিকবার সেচ করে শুকিয়ে ফেলে সকল প্রকার মাছ তথা জলজ প্রাণী ধরে থাকে। যার ফলে কোন মাছ অবশিষ্ট থাকে না যা পরবর্তী মৌসুমে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ডিম ছেড়ে বাচ্চা দিতে পারে। এক কথায় বলা যায়, শুস্ক মৌসুমে এমন মা মাছ অবশিষ্ট থাকে না, যা প্রজননের ফলে নতুন মাছ জন্মাতে পারে। কারেন্ট জাল ও মাছ ধরার বিভিন্ন ধরনের ফাঁদের মাধ্যমে সকল ছোট বড় (রেনু পোনা থেকে ডিমওয়ালা) মাছ নির্দয়ভাবে অতি আহরণ করা হচ্ছে। এক কথায়, একবারে সকল মাছ ধরে ফেলার প্রবণতা ও অভ্যাসের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল যা এক সময় অফুরন্ত মৎস্য ভান্ডার ছিল, তা এখন মৎস্য শূণ্য হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

গ) অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার

বাংলাদেশ অতি প্রাচীন কাল হতেই মৎস্য সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এক সময় দেশে উৎপাদিত অধিকাংশ মাছ মুক্ত জলাশয় হতে পাওয়া যেত কিন্ত মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার অন্যতম। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল খাদ্য-শস্য, শাক-সবজী ইত্যাদি চাষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এ সকল ফসল চাষাবাদের সাথে সাথে রোগ-বালাইও অনেকাংশে বেড়ে গেছে। আর আমাদের দেশের সাধারণ কৃষক অজ্ঞতাবশতঃ এই রোগ-বালাই দমনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে দেশে ৯২ টি কোম্পানির ৩৭৭ প্রকারের বালাইনাশক বাজারজাতকরণের জন্য নিবন্ধিত আছে (২০০৫)। প্রতি বছর দেশে প্রায় ৮০০০ মে.টন কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের আনুমানিক ২৫% অর্থাৎ প্রায় ২০০০ মে.টন বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিকটবর্তী উন্মুক্ত জলাশয়ে পড়ে। কৃষি জমিতে এত ব্যাপক পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জলজ জীব-বৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখিন।

মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাছ ও জলজ জীবের উপর নিম্নলিখিত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে:

- মাছ জলজ পরিবেশ হতে খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য হিসেবে অনুজীব, উদ্ভিদ কণা, প্রাণী কণা, অমেরুদন্ডী প্রাণী, মেরুদন্ডী প্রাণী এবং বিভিন্ন প্রকার নিমজ্জিত ও ভাসমান উদ্ভিদ গ্রহণ করে থাকে। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এসকল খাদ্যকণা মারা যায়, ফলে জলজ খাদ্য-শিকল ধ্বংশ হয়। ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার করলে ৭ দিন পর্যন্ত মাটি ও পানিতে তার প্রভাব পাওয়া যায়।
- এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ডিডিটি, রিপকর্ড, সিমবুশ ইত্যাদি জাতীয় কীটনাশক মাছের জন্য চরম বিষাক্ত। এ সকল কীটনাশক নীচু এলাকার ধান ক্ষেতে প্রয়োগের সাথে সাথে ওই স্থানসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থানরত মাছের সাথে সাথেই মৃত্যু ঘটে।
- মাছের দেহের যে অংশে চর্বির পরিমান বেশী থাকে সেখানেই কীটনাশক জমা হয়। এছাড়া মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর শুক্রাশয়, ডিম্বাশয় ও ডিমে তুলনামূলকভাবে বেশী পরিমাণে কীটনাশক জমা হয় ফলে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় মাছের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন বৃক্ক, পাকস্থলি, যকৃত, ফুলকা, মস্তিস্ক, ত্বক ও মাংশপেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ বিভিন্ন প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং তাদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।
- কীটনাশকের প্রভাবে নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং এর বিষক্রিয়ায় ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের কার্যকারিতা বহুলাংশে হ্রাস পায় অর্থাৎ ডিম্বানু ও শুক্রানু যথাযথভাবে উৎপন্ন হয় না, সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হলেও তার পরিপক্কতা আসেনা বা বিলম্ব হয় এবং ডিম ফুটে বাচ্চা হলেও তাদের বেশীর ভাগই মারা যায় কিংবা বিকলাঙ্গ হয়। কীটনাশক ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উৎসের মাছের প্রজনন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে নতুন প্রজন্মের মাছের পুনঃ উৎপাদন না হওয়ায় দিন দিন উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

- আমাদের দেশে সাধারণত বৈশাখ-আষাঢ় মাসে অধিকাংশ মাছের প্রজনন হয় বা মাছ ডিম দিয়ে থাকে। কৈ, পুটি, মাগুর, শিং, টাকি, শোল, গজাল, বেলে, টেংরা প্রভৃতি মাছ সাধারণত: অল্প পানিতে ধানের জমিতে ডিম দেয় এবং বাচ্চা লালন করে। ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এ সমস্ত এলাকার পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ে এজন্য এসকল ধান ক্ষেতকে মাছ তাদের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে প্রাকৃতিক জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় অনেক মাছ ডিম ছাড়তে পারে না।
- কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মাছের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং মাছের বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় ফলে মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

মিষ্টি পানি নির্ভরশীল বিলে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় উত্তরণের অভিজ্ঞতা

পরীক্ষামূলকভাবে উত্তরণ ২০০৩ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার জাতপুর ও পাঁচরুখী গ্রামের হিংলার বিল, পালশের বিল, দাতীর বিল ও বকচর বিল নামের চারটি মিষ্টি পানির বিল নির্বাচন করে দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেয়।

এ প্রকল্পের অধীনে বিল সংলগ্ন বিভিন্ন শ্রেণী, পেশার লোক নিয়ে একটি এবং কুয়ো মালিকদের নিয়ে একটি অবহিতকরণ সভা করা হয়। অতঃপর মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের জন্য হিংলার বিলে ৪০টি এবং পালশের বিলের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত ১১টি কুয়া পুনঃখনন করা হয়।

প্রত্যেক বিলের নিম্নাংশে অবস্থিত দুটি কুয়ায় এ অঞ্চল হতে বিলুপ্তপ্রায় ০৭ প্রজাতির মা মাছ যেমন- মেনি/রয়না, গজাল, সঁরপুটি, টেংরা (গুলশা), চান্দা, তারা বাইন, ফলি প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগ্রহ করে এবং এ অঞ্চলে বিদ্যমান শোল, খলিশা, টাকি, শিং, মাগুর স্থানীয় বাজার হতে ক্রয় করে বৈশাখ মাসের শুরুতে কুয়ায় মজুদ করা হয়।

কুয়ার পানি ঠিক রাখার জন্য বাইরে থেকে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং নিয়মিত দিনে ২ বার কুয়ায় খাবার দেয়া হয় এভাবে বৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ কুয়ার উপরের জমিতে পানি না উঠা পর্যন্ত মা মাছগুলোকে লালন পালন করা হয়।

তারপর বৃষ্টির পানিতে যখন চারিদিক তলিয়ে যায় তখন কুয়োর মাছ ও মাছের পোনা কুয়ার বাইরের ধান ক্ষেতকে তাদের প্রজনন ও চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কুয়োর পাড় কেটে দেয়া হয়। এ সময় যেন কেউ মা মাছ ও ছোট পোনা মাছ ধরতে না পারে সেজন্য বিল সংলগ্ন জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাইকিং ও সভা করা হয়। মৎস্য সম্পদের পরিমাণ ও প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বর্ষার শুরু থেকে ৪ মাস (জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) বিলে কোন প্রকার মাছ ধরা হবে না । আশ্বিণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে বিলে মাছ ধরা শুরু হয়। এছাড়া বিলে সকল প্রকার অবৈধ জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এ ব্যবস্থা কার্যকর করার ফলে বিলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং মৌসুমের শেষে বিলে প্রচুর পরিমানে মাছ পাওয়া যায়।

বছর শেষে দেখা যায় মজুদকৃত বিল দুটিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ গুণ, দরিদ্র মানুষের আমিষের চাহিদা মিটেছে আগের বছরের তুলনায় ৯ গুণ। আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ এ দুটি বিলে আবার পুনঃউৎপাদিত হয়েছে। খাদ্য শৃঙ্খলে মাছের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাছের উপরের খাদক শ্রেণীর প্রাণী যেমন-গুইসাপ, পাখি ইত্যাদির পরিমান বেড়ে যায়। এ দুটি বিলের প্রভাবে আশে-পাশের বিল দুটিতেও কিছু কিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছ দেখা যায়।

পক্ষান্তরে হিংলার বিল সংলগ্ন দাতীর বিল ও পালশের বিল সংলগ্ন বকচর বিলে কোন প্রকার মা মাছ মজুদ করা হয় না এবং কোন কুয়া পুনঃখনন বা সংস্কার করা হয় না। ফলে দেখা যায় এ দুটি বিলের উৎপাদন একেবারেই কম।

সীমাবদ্ধতা

- সময়মতো বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে কিছু কিছু মাছের প্রজননে সমস্যা দেখা দেয়।
- গজাল মাছের প্রজনন তুলনামুলকভাবে কম হয়।
- পোনা মাছ যখন কুয়ো থেকে জমিতে অর্থাৎ চারণভূমিতে উঠে আসে তখন অন্য এলাকা থেকে মৎস্যজীবীরা রাতে কিছু মাছ চুরি করে নিয়ে যায়।

করণীয়

বিলের মাছকে প্রাকৃতিক আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয় তালা ও তেতুলিয়া এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের মাছের চাহিদা পূরণ করতে পারে এই সকল বিল।

এই সকল বিলের সম্ভাবনা অসীম। এর জৈবিক উৎপাদনশীলতা অনেক বেশী। শুধু প্রয়োজন পরিকল্পিত উপায়ে বিলপাড়ে গড়ে ওঠা বসতির লোকজনদের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ এবং জাগিয়ে তোলা দরকার প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ রক্ষার তাগিদ এবং সচেতনতা। বিলপাড়ের বসবাসকারী বিভিন্ন সাধারণ মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ এবং পূন:উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা একান্ত জরুরী:

ক) বিলপাড়ের মানুষদের নিয়ে বিলকেন্দ্রিক কমিটি গঠন করা

সকল কার্যক্রমে জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদে তাদের অধিকার ও তার থেকে সুফল লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং বিলপাড়ে বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবীদেরকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিলকেন্দ্রিক কমিটি গঠন করতে হবে।

বিল পাড়ে বসবাসকারী সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষদের নিয়ে দুই স্তর বিশিষ্ট বিল কমিটি গঠন করা যথা-

১) প্রত্যেক বিলের জন্য একটি করে বিল কমিটি
২) বিল কমিটি সমূহের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় বিল কমিটি।

এই কমিটি নিয়মিতভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ যথা- মা মাছ সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রচেষ্টা চালাবে। যার ফলে স্থানীয় জনগণ তাদের করণীয় নির্ধারন করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে নিজেরাই মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

খ) মা মাছ মজুত ও সংরক্ষণ করা

যে সকল প্রজাতির মাছের আবাস এই সকল বিল, সে সকল প্রজাতির মা মাছ বিলের ভেতরে একটি সুনির্দিষ্ট কুঁয়োর ভেতরে মজুত করতে হবে এবং এই কুঁয়ো থেকে কোন ধরনের মাছ ধরা যাবে না। বৃষ্টি আসার সঙ্গে সঙ্গে কুঁয়োর মুখ খুলে দিতে হবে যাতে মাছগুলো প্লাবণ ভূমির মধ্যে ছড়িয়ে ডিম ছাড়তে পারে অথবা তাদের বাচ্চা নিয়ে মা মাছগুলো বিলে বিচরণ করতে পারে। কোনও কুয়া বছরে একবারের বেশী সেচ দিয়ে মাছ ধরা যাবে না। মাছ ধরা শেষে কুয়ায় আবার পানি ভরে দিতে হবে এবং প্রত্যেক প্রজাতির কিছু কিছু মাছ পুনরায় কুয়ায় ছেড়ে দিতে হবে।

গ) মা মাছ চুরি রোধ করা

বৈশাখ মাসে কুয়োয় যখন মা মাছ মজুদ করা হয় তখন অল্প জায়গায় বেশী মাছ থাকার কারণে মাছ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে এজন্য বৈশাখ মাসে যখন মা মাছ কুয়োয় মজুদ করা হবে তখন যেন কোন মাছ চুরি হয়ে না যেতে পারে তার জন্য কুয়োয় পর্যাপ্ত পালা দিতে হবে, বিল কমিটির মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছ ধরা বন্ধ করা

সাধারণত: বিল পাড়ের বসবাসকারীরা বর্ষার শুরু থেকেই নানা রকম ফাঁদ যথা ঘুনসি, চারো, বরশী কৈজাল, কারেন্ট-জাল ইত্যাদি দিয়ে বর্ষার শুরুতেই নির্বিচারে মা মাছসহ ছোট ছোট মাছ ধরতে থাকে। তাই একটি নির্দিষ্ট সময় তথা বৈশাখ মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বিলগুলোতে মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। এর ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে।

ঙ) জলাভূমি সংরক্ষণ

আমাদের দেশের জলাভূমিগুলো সম্পদে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকারের মাছ ও জলজ জীবের আবাসস্থল হলো এই জলাভূমি, ভুগর্ভস্থ পানির লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে এই জলাভুমি এজন্য জলাভুমি সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব জলাভূমির উপযুক্ত পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একদিকে পরিবেশের বিপর্যয় নেমে আসছে, অন্যদিকে জলাভূমির উপর নির্ভরশীল এলাকার জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ক্রমেই এক সংকটজনক অবস্থায় এসে পৌঁছাচ্ছে। বোরো মৌসুমে ধান চাষের জন্য জলাভূমি শুকিয়ে ফেলা হচ্ছে, কীটনাশকের পর্যাপ্ত ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী কণা, অমেরুদন্ডী প্রাণী, মেরুদন্ডী প্রাণী মারা যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের চিরচেনা গরীবের আমিষ দেশীয় প্রজাতির মাছ, দিনে দিনে জলাভূমি তার জীব-বৈচিত্র্য হারাচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখনই জলাভূমি সংরক্ষণ করতে হবে, ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের অতীত ঐতিহ্য। জলাভূমি সংরক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

উপসংহার

ঐতিহ্যগতভাবে তালা ও তেতুলিয়া ইউনিয়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এ বিলগুলোর দেশীয় মাছ আমাদের কৃষি ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কর্মকান্ডের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে এ সকল বিলের দেশীয় প্রজাতির মাছ। অথচ বাজারে দেশীয় মাছের চাহিদা অন্যান্য মাছের তুলনায় অনেক বেশী। দেশীয় প্রজাতির এসকল বিলের মাছের বাজার মূল্য কয়েক গুণ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এসকল বিলে প্রতি বছর ডিমওয়ালা মাছের মজুদ, প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন ঘটিয়ে এবং সঠিকভাবে বিল ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব কোটি টাকার মাছ। এ অঞ্চলের এই সুন্দর সুস্বাদু বিলের মাছগুলো চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আগেই এগুলোকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে হবে এখনই। তাহলেই বিলের জীব-বৈচিত্র বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্টির পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে।

উত্তরণ

৪২, সাত মসজিদ রোড (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : +৮৮-০২-৯১২২৩০২
E-mail : uttaran@bdonline.com
website : http://uttaran.org